বাইয়াতের হাকিকাত

অধ্যাপক গোলাম আযম

বাইয়াতের হাকিকাত

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক

মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ মা'ছুম

চেয়ারম্যান

প্রকাশনা বিভাগ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৭

১৮তম মুদ্রণ : জুলাই - ২০০৮
শ্রাবণ - ১৪১৫
রজব - ১৪২৯

মূল্য ঃ নির্ধারিত ১৫.০০ (পনের টাকা) মাত্র

কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

BAIYATER HAKIKAT by Prof. Ghulam Azam, Published by Publications Department, Jamaat-e-Islami Bangladesh,

Price : Fixed 15.00 (Fifteen Taka) only

সূচিপত্র

বাইয়াতের হাকিকাত

বাইয়াত ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর নিকট বাইয়াত হয়েছেন। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নিকট বাইয়াত হয়েছেন। মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনের পরিচালনার দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত হয়েছে তাঁর নিকট বাইয়াত হওয়ার এ তরীকা ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। প্রথম চার খলীফার পরও বাইয়াতের এ ধারা জারি ছিল। এমনকি যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই সেখানেও দীনি মহলে বাইয়াত শব্দটি বেশ প্রচলিত আছে।

আমাদের দেশে পীর–মুরীদীর বেলায়ই এ পরিভাষাটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। যিনি মুরীদ হতে চান তাকে পীর সাহেবের নিকট বাইয়াত হতে হয়। দেশে বেশ সংখ্যক পীর সাহেবান আছেন বলে এ পরিভাষাটি ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিন্তু অনেকেই ইসলামের বাইয়াত পরিভাষাটির সঠিক তাৎপর্য (হাকিকাত) জানেন না। অথচ এ বিষয়টি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ সম্পর্কে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

বাইয়াতের শাব্দিক অর্থ

বাইয়াত শব্দটি আরবী بَيْعٌ শব্দ থেকে গঠিত। 'বাইয়' অর্থ বেচা-কেনা, লেন-দেন, বিক্রি করা-খরিদ করা। এ শব্দটি বিক্রয় ও খরিদ উভয় অর্থেই ব্যবহার করা হয়। তবে এর আসল অর্থ বিক্রয়। জিনিস দিয়ে দাম নেয়ার নাম بَيْعٌ এবং দাম দিয়ে জিনিস নেয়ার নাম شَرَاءٌ। এভাবেই بَيْعٌ অর্থ বিক্রি ও شَرَاءٌ অর্থ ক্রয়। যেহেতু বিক্রয় ছাড়া ক্রয় হতে পারে না, এবং ক্রয় ছাড়া বিক্রয় হতে পারে না সেহেতু এ দু'টো শব্দই উভয় অর্থেই

ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অবশ্য বিক্রয়ের কাজটাকেই বাইয়াত বলা হয়।

بَيْعَةٌ শব্দের মূল অর্থ বিক্রয় বটে, কিন্তু এর গৌণ (SECONDARY) অর্থ হলো চুক্তি, শপথ, অংগীকার। বেচা-কেনার ব্যাপারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যেসব শর্ত (Terms) ঠিক করা হয় তা মেনে নেয়ার চুক্তির ভিত্তিতেই লেন-দেন হয়ে থাকে। এভাবেই বাইয়াত শব্দটি চুক্তি, শপথ, অঙ্গীকার, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আনুগত্য স্বীকার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়।

بَيْعَةٌ শব্দের ক্রিয়া-বাচক শব্দ হলো بَاعَ এর অর্থ শুধু বিক্রয় শব্দেই সীমাবদ্ধ নয়। এর অর্থ হয় চুক্তি করা, সম্মান প্রদর্শন করা, নেতৃত্ব মেনে নেয়া, আনুগত্যের শপথ করা, বিক্রয়ের জন্য পেশ করা, চুক্তি চূড়ান্ত করা এবং ব্যবসায় লেন-দেন করা ইত্যাদি।

বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধান مُعْجَمُ اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُعَاصِر যার সংকলক MILTON COWAN, তাতে بَيْعٌ অর্থ লিখা হয়েছে :

To sell, to make a contract, to pay homage, to acknowledge as sovereign or leader, to pledge allegiance, to offer for sale, to agree on the term of a sale, to buy, to purchase etc.

এ অভিধানে بَيْعٌ অর্থ লিখা হয়েছে - agreement, arrangement, business deal, commercial transacion, bargain, sale, purchase, homage etc.

কুরআনে এ পরিভাষার ব্যবহার

কুরআন মজীদে বাইয় শব্দটি বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রুজি রোজগারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম কাজে লেগে থাকার অর্থে কয়েকটি সূরায় ব্যবহার করা হয়েছে।

اِذَانُودِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ-

'জুমআর দিনে যখন নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা বাদ দাও।' (সূরা জুমআ : ৯ আয়াত)

رِجَالٌ لَّاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللّٰهِ

'সেসব লোক যাদেরকে ব্যবসা, বেচা-কেনা ও কাজ-কারবার ইত্যাদি কোন কিছুই আল্লাহর যিক্‌র থেকে গাফেল করে দেয়না।'

(সূরা নূর : ৩৭ আয়াত)

এ দুটো আয়াতে জীবিকা অর্জনের সব রকম ব্যবস্থাকেই বাইয় শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

সূরা তাওবা, সূরা ফাতহ, সূরা মুমতাহিনায় বাইয় শব্দটি রূপকভাবে বিক্রয় অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে বিক্রয় মানে নিজের সত্তা ও জান-মালকে কোন মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও রাসূলের নিকট সমর্পণ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া বা ওয়াদা করা।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ- يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং নিজেরাও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তাদের জন্য (বেহেশত দেয়ার এ ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্বে একটা পাকা ওয়াদা, আল্লাহর চেয়ে বেশী ওয়াদা পূরণকারী

আর কে আছে? সূতরাং তোমরা যে বাইয়াত করেছ সে বিষয়ে তোমরা সন্তুষ্ট থাক। এটাই সবচেয়ে বড় কামিয়াবী।' (সূরা তাওবা : ১১১ আয়াত)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهِ ط يَدُاللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ-

'হে রাসূল! যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল, তারা আসলে আল্লাহর নিকটই বাইয়াত হচ্ছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহর কুদরতের হাত ছিল।' (সূরা ফাতহ : ১০ আয়াত)

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ-

'হে রাসূল! আল্লাহ মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল।' (সূরা ফাতহ : ১৮ আয়াত)

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'হে নবী! আপনার নিকট যদি মেয়েরা এ কথার উপর বাইয়াত হবার জন্য আসে যে তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তাদের সন্তান হত্যা করবে না, নিজেরা কোন অপবাদ রচনা করে আনবে না ও ন্যায্য ব্যাপারে আপনার অবাধ্য হবে না, তাহলে আপনি তাদের বাইয়াত কবুল করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।' (সূরা আল-মুমতাহিনা : ১২ আয়াত)

এ কয়টি আয়াতে বাইয়াত শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থে ইসলামী পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা তাওবাতে জান ও মাল আল্লাহর নিকট সমর্পণ

করার অর্থে, সূরা ফাত্হে রাসূলের নির্দেশে মৃত্যুবরণ করার অর্থে এবং সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি না করার ওয়াদার অর্থে বাইয়াত কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের শপথই এসব বাইয়াতের আসল উদ্দেশ্য।

সূরা তাওবাতে বাইয়াত মানে মুমিনদের জান ও মালকে আল্লাহর মর্জি মতো কাজে লাগাবার এবং নিজেদের খেয়াল এবং খুশি মতো ব্যবহার না করার ওয়াদা। সূরা ফাতহে বাইয়াত মানে রাসূল (স.)-এর নির্দেশে জীবন দেবার শপথ করা। হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে হযরত উসমান (রা.)-কে মক্কাবাসীরা হত্যা করেছে বলে গুজব শুনে কুরাইশদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র অবস্থায়ও উপস্থিত সকল সাহাবা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত বলে ঐ শপথ করেছিলেন। আর সূরা মুমতাহিনাতে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য না হওয়ার ওয়াদাই বাইয়াতের উদ্দেশ্য। সূতরাং এসব কয়টি আয়াতেই বাইয়াতের সারমর্ম হলো মু'মিনের জান-মাল, ইচ্ছা-বাসনা অর্থাৎ তার পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহর মর্জির নিকট সমর্পণ করা। এটাই ইসলাম কবুলের মর্মকথা। ইসলাম শব্দের অর্থও আত্মসমর্পণ। বাইয়াতের মাধ্যমেই আত্মসমর্পণের বাহ্যিক রূপ প্রকাশ পায়।

বাইয়াতের ব্যাখ্যা

সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মু'মিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা একথা বলেননি যে, মু'মিনরা তাদের জান-মাল তাঁর কাছে বিক্রয় করেছে। কিন্তু মালের মালিক যদি তার মাল নিজ ইচ্ছায় বিক্রয় না করে তাহলে সে মাল কেউ খরিদ করতে পারে না। কারণ জোর করে নিলে তা কেনা হয়েছে বলে গণ্য হয় না।

সব মু'মিনই আল্লাহ্র নিকট তাদের জান ও মাল বিক্রয় করে না। যারা বিক্রয় করে তারাই সত্যিকার মু'মিন। তাই এ আয়াতে আল্লাহ্ একথাই বলতে চেয়েছেন যে, যারা নিজ ইচ্ছায় তাদের জান-মাল বিক্রয় করেছে তাদের কাছ থেকেই তিনি কিনেছেন। অর্থাৎ যাদের জান-মাল তিনি কিনেছেন তারা সন্তুষ্ট চিত্তেই তা বেচতে রাজি হয়েছে। তাদের কাছ থেকে জোর করে কেনা হয়নি বা তাদেরকে বেচতে বাধ্য করা হয়নি।

কোন জিনিস কারো কাছ থেকে কিনলে বিক্রেতাকে তার দাম অবশ্যই দিতে হয়। তা নাহলে কেনার দায়িত্ব পালন করা হয় না। দাম না দিয়ে জিনিস নিলে বুঝা যায় যে, মালের মালিক তার মাল কাউকে দান করেছে, বিক্রয় করেনি। তাই আল্লাহ্ পাক মু'মিনের জান-মাল কিনে নিয়েছেন বলার সাথে সাথেই দামের কথাও উল্লেখ করেছেন। যে দাম তিনি দিতে চান তা দুনিয়ার কোন জিনিস নয়। তিনি এত বিরাট মূল্য দিতে চান যা দুনিয়ার কোথায়ও পাওয়া যায় না।

মু'মিনের জান-মালের বদলে তিনি বেহেশত দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। যেহেতু বেহেশত দুনিয়ার জীবনে পাওয়ার উপায় নেই, সেহেতু এখানে নগদ দাম পরিশোধ করাও সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বাকীতেই মু'মিনের জান-মাল কিনে নিয়েছেন।

আল্লাহ নগদ দাম দিচ্ছেন না বলে মু'মিনের জান-মালও বিক্রয় করার সাথে সাথেই তিনি নিয়ে নেন না। বরং মু'মিনের জান-মাল তার কাছেই আমানত রাখেন। যদি কেনার সময় জান-মাল আল্লাহর নিজের হাতেই নিয়ে নিতেন তাহলে ঝামেলাই চুকে যেতো। কিন্তু আল্লাহ পাক কিনে নেয়ার কথা স্বীকার করেও মু'মিনের জান-মাল তার কাছেই আমানত রেখেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক বলতে চান যে, হে মু'মিন ! তোমার জান-মাল আমার কাছে বিক্রয় করেছ বলে তুমি যে দাবী করছ তা তোমাকে বাস্তবে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। তোমার জান ও মাল আর তোমার মালিকানায় নেই। তোমার বাকী জীবনে এ জান ও মাল যদি সম্পূর্ণরূপে আমার মর্জি মতো ব্যবহার কর তাহলে আমি স্বীকার করবো যে তুমি তা সত্যিই আমার কাছে বেচেছ। এ প্রমাণ দিতে পারলে মৃত্যুর পরপারে এর দাম হিসেবে বেহেশত অবশ্যই পাবে।

রাসূলের নিকট বাইয়াত হওয়ার অর্থ কি?

কোন মাল একবার কারো কাছে বিক্রয় করার পর এর মালিকানা স্বত্ব ক্রেতার হাতে চলে যায়। বিক্রেতা এ মাল আবার অন্য কারো কাছে বেচতে পারে না। কারণ এক মাল একই ব্যক্তি কেমন করে বার বার বিক্রয় করবে?

মু'মিন তার জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করার পর এর মালিকানা স্বত্ব ক্রেতার হাতে চলে গেছে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর কাছে বাইয়াত হয়েছেন বলে কুরআন ও হাদীসে প্রমাণিত। তাই প্রশ্ন জাগে যে, রাসূল (সা.)-এর কাছে বাইয়াত হওয়ার মানে কি? একবার আল্লাহর কাছে জান-মাল বিক্রয় করা হয়েছে। রাসূল (সা.)-এর নিকট আবার কী বিক্রয় করা হলো? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব পেলেই বাইয়াতের হাকিকাত বুঝা যাবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মু'মিনের জান-মাল কিনে তারই হাতে

আমানত রেখে দেন। সচেতন মু'মিন একথা ভালভাবেই জানে যে, তার যে জান ও মাল আল্লাহর মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয়েছে তা আল্লাহর মর্জি মতো কাজে লাগানোই সঠিক দায়িত্ব। শয়তানের ওয়াসওয়াসায় ও নফসের ধোঁকায় পড়ে, পরিবার পরিজনের দাবীতে এবং আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের চাপে পড়ে আল্লাহর মর্জির খেলাফ জান ও মাল খরচ করে ফেলার প্রবল আশঙ্কা অবশ্যই রয়েছে। তাই আল্লাহর এ আমানত সঠিকভাবে আল্লাহর মর্জি মতো ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর নিকট বাইয়াত হয়েছেন।

আল্লাহর নিকট জান-মাল বিক্রয় করা মানে যাবতীয় মানসিক, দৈহিক ও বস্তুগত শক্তি সামর্থ এবং সময়, সম্পদ ও শ্রম আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে ব্যবহার করার ওয়াদায় আবদ্ধ হওয়া। এ ওয়াদা এমন ব্যাপক যে ইচ্ছা শক্তি, চিন্তা শক্তি, মনন শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিকেও আল্লাহর মর্জির অধীন করা বুঝায়। এইরূপ পূর্ণাঙ্গ দাবী পূরণ করতে হলে আল্লাহর সাথে গোপনে চুক্তিবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়। মানুষ যেভাবে শয়তানের ওয়াসওয়াসা, নফসের ধোঁকা, দুনিয়ার মোহ, অন্য মানুষের প্ররোচনা ইত্যাদি দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে তাতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছাড়া আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করা বাস্তবে সম্ভব হয় না। একারণেই আল্লাহর রাসূলের দীনি দাওয়াত যারা কবুল করেছেন তাদেরকে রাসূলের নেতৃত্ব মেনে জামায়াতবদ্ধ হবার তাগিদও আল্লাহই দিয়েছেন। এ জাতীয় সাংগঠনিক বন্ধন ছাড়া আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের পথে অগণিত বাধা দূর করা সম্ভব নয়।

যারা সাংগঠনিক শৃঙ্খলা কবুল করে রাসূলের জামায়াতে শরীক হতে রাযী হয়েছেন তারা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের উদ্দেশ্যে সংগঠনের নির্দেশ পালন করতে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন, যাতে সকল প্রকার ধোঁকার থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। ইসলামী জামায়াতের আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য বাস্তবে সহজ ও সম্ভব হয়। জামায়াতের আনুগত্যের এ শপথই ইসলামী পরিভাষায় বাইয়াত নামে পরিচিত। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর নিকটে যে বাইয়াত হন তা এ আনুগত্যেরই শপথ।

সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবন এ কথারই সাক্ষী যে, তারা বাইয়াতের এ তাৎপর্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এ বাইয়াতের দাবী হলো রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য। তাই দেখা যায় যে, রাসূল (সা.) কোন কাজের নির্দেশ দিলে বিনা ওযরে সাহাবায়ে কেরাম তা পালন করতেন। যারা ওযর পেশ করতো তাদেরকে কুরআনে মুনাফিক বলা হয়েছে।

একবার রাসূল (সা.) সবাইকে যুদ্ধে যাবার হুকুম দিলেন। এক সাহাবীর মা মৃত্যু শয্যায় থাকা সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যথা সময়ে হাযির হয়ে গেলেন। তিনি রাসূল (সা.)-কে মায়ের অবস্থাটা জানালেন। ওযর পেশ করে না যাওয়ার উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল না। কিন্তু অবস্থা জেনে রাসূল (সা.)-তাকে মায়ের খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ঐ সাহাবী মাকে এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া সম্ভব নয় বলে নিজেই যুদ্ধে না যাবার সিদ্ধান্ত নেননি। কারণ বাইয়াতের দরুণ এমন সিদ্ধান্ত নেবার কোন ইখতিয়ারই নেই বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রাসূলের হাতে তিনি তুলে দিয়েছেন বাইয়াতের মাধ্যমে। তাই কোন ওযর আপত্তি দেখিয়ে রাসূলের আদেশ পালন না করার সিদ্ধান্ত তিনি নেননি। যদি তিনি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে রাসূলের নিকট হাজির না হতেন এবং নিজেই না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে তা বাইয়াতের খেলাফ হতো।

রাসূল (সা.) অবস্থা জেনে তাঁকে মায়ের খেদমত করার অনুমতি দেয়ার ফলে তিনি যুদ্ধে না যেয়েও এর সওয়াব পেয়ে গেলেন। তদুপরি মায়ের খেদমতের সওয়াবও পেলেন। কিন্তু যদি তিনি নিজে এ সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে রাসূল (সা.)-এর আদেশ অমান্য করার মতো বড় অন্যায় হয়ে যেতো।

রাসূলের নির্দেশে তাবুকের যুদ্ধে যেতে রাজি হয়েও বিলম্ব করে ফেলার কারণে ৩ জন সাহাবীকে ৫০ দিন পর্যন্ত একঘরে করে রাখা হয়েছিল। আল্লাহ পাক নিজে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার কথা ঘোষণা না করা পর্যন্ত

তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছিল। বাইয়াতের মর্যাদা রক্ষার গুরুত্ব কতটুকু তা এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট।

এ বাইয়াত কি শুধু রাসূলের কাছেই হতে হয়?

সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূল (সা.)-এর নিকট বাইয়াত হয়েছিলেন। রাসূল (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মানবসত্তা নেই। অথচ রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর সাহাবাগণ হযরত আবু বকরের (রা.) নিকট আবার বাইয়াত হলেন। এভাবেই পরবর্তী খলিফাগণের নিকট বাইয়াত হতে হয়েছে। এ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে বাইয়াত এমন এক জরুরী নিয়ম যা রাসূলের পরও চালু রাখতে হয়েছে এবং উম্মতের মধ্যে এ নিয়ম চিরদিনই চালু থাকা উচিত।

অবশ্য রাসূল (সা.)-এর নিকট বাইয়াত ও পরবর্তী কারো নিকট বাইয়াতের মধ্যে আনুগত্যের ব্যাপারে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সর্বাবস্থায় বিনা শর্তে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করতে হয়, কিন্তু রাসূল ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য অন্ধভাবে করা চলে না, কুরআন সুন্নাহর অধীনে তাদের আনুগত্য করতে হয়। রাসূলের আনুগত্য নিরঙ্কুশ ও নি:শর্ত, অন্যের বেলায় তা শর্তাধীন। এখন প্রশ্ন হলো ইসলামী বিধান অনুযায়ী এ বাইয়াত কার নিকট হওয়া উচিত? ইতিহাস থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের জামায়াতে বা সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট বাইয়াত হতে হয়। যতদিন রাসূল (সা.) নিজে এ জামায়াতের দায়িত্বশীল ছিলেন ততদিন তারই নিকট বা তার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নিকট বাইয়াত হতে হয়েছে। দুনিয়া থেকে তার বিধায় হবার পর ঐ জামায়াতের দায়িত্ব যার উপর পড়েছে তারই নিকট বাইয়াত হতে হয়েছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের সময় থেকেই এ বিরাট শিক্ষা চলে এসেছে যে, মুসলমানদেরকে জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং যিনিই ঐ জামায়াতের নেতা নির্বাচিত হন তাঁরই কাছে বাইয়াত হতে হবে। জামায়াতবিহীন অবস্থায় থাকা মুসলমানদের উচিত নয় এবং

জামায়াতবদ্ধ হবার প্রমাণই হলো জামায়াতের আমীরের নিকট বাইয়াত হওয়া।

বর্তমানে সারা দুনিয়ার একশ' পঁচিশ কোটি মুসলমান এক জামায়াতবদ্ধ অবস্থায় নেই। তাই গোটা উম্মতের কোন একজন নেতা বা আমীর নেই। এমনকি কোন এক দেশের সব মুসলমানও এক জামায়াতবদ্ধ নয়। প্রকৃত অবস্থা এই যে, বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে জামায়াতবদ্ধ হওয়ার চেতনাই দুর্বল হয়ে গেছে। এমনকি ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এ চেতনা ব্যাপক নয়। এ কারণেই মুসলিমদের জীবনেই ইসলামের প্রভাব এত কমে গেছে।

প্রচলিত বাইয়াত

সাহাবায়ে কেরামের যুগে যে উদ্দেশ্যে বাইয়াতের প্রচলন হয়েছিল বর্তমানে ঐ মহান উদ্দেশ্য চালু না থাকলেও বাইয়াত এর পরিভাষা সমাজে এখনও প্রচলিত আছে।

বেশ কয়েকটি আরব দেশের বাদশাহগণ সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের অংশ হিসেবে দেশের নাগরিকদের বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ বাইয়াত দ্বারা বাদশাহর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য প্রকাশ করাই আসল উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে পীর সাহেবান তাদের মুরীদদের বাইয়াত গ্রহণ করেন। দীনের ব্যাপারে পীর সাহেবের হেদায়েত অনুযায়ী চলবার ওয়াদাই এ বাইয়াতের উদ্দেশ্য।

বাইয়াতের আসল উদ্দেশ্য

রাসূল (সা.)-এর নিকট সাহাবায়ে কেরাম যে উদ্দেশ্যে বাইয়াত হতেন সেটাই হলো আসল উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্যে বাইয়াত এর পদ্ধতি চালু করতে হলে কয়েকটি শর্ত পূর্ণ হতে হবে।

১. রাসূল (সা.) ইকামাতের দীনের যে আন্দোলন করেছিলেন সে আন্দোলনের দাওয়াত সমাজে পেশ করতে হবে।

২. এ দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা আন্দোলনে শরিক হতে আগ্রহী তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে।

৩. তাদের মন-মগজ ও চরিত্রকে ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. যারা ইকামাতে দীনের বিরাট দায়িত্ব ভালভাবে বুঝে নিয়ে তাদের জান ও মাল আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে আগ্রহী তাদের নিকট থেকে বাইয়াত নিতে হবে।

৫. ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে গঠিত জামায়াতের সদস্যদের দ্বারা যিনি জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন, তারই নিকট বাইয়াত হতে হবে। এ নিয়মে যদি বাইয়াত চালু হয় তাহলে তা প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তির নিকট বাইয়াত হওয়া বুঝায় না, বরং ইসলামী জামায়াত বা সংগঠনের নিকটই বাইয়াত হওয়া বুঝায়।

মূলত, বাইয়াত ব্যক্তি বিশেষের নিকট নয়, ইসলামী সংগঠনের নিকট হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য কোন ব্যক্তির নিকটই বাইয়াতের শপথনামা পেশ করতে হয়। কেননা সংগঠন কোন জীবন্ত সত্তা নয় যার নিকট তা পেশ করা যায়। তাই সংগঠনের দায়িত্বশীলের মাধ্যমে ইসলামী সংগঠনের নিকট বাইয়াত হতে হয়।

ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামীর মতো যেসব সংগঠন ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে বাইয়াতের এ ধারণাই চালু রয়েছে। যারা জামায়াতে ইসলামীর রুকন (সদস্য) হন, তারা শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠনের নিকট বাইয়াত হন। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ৮ নং ধারা অনুযায়ী "আমীরে জামায়াত বা তাঁর কোন প্রতিনিধির সামনে রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ" করতে হয় এ শপথই বাইয়াত হিসেবে গণ্য।

বাইয়াতের দাবী

ইকামাতে দীনের মহান লক্ষ্যে পরিচালিত কোন ইসলামী সংগঠনের নিকট যে ব্যক্তি বাইয়াত হন তার নিকট এ বাইয়াতের দাবী নিম্নরূপ :

১. এই বাইয়াতের মাধ্যমে ব্যক্তির জান ও মাল অর্থাৎ তার গোটা সত্তা, যা আল্লাহর নিকট বিক্রয় করা হয়েছে, তা সাংগঠনিক পদ্ধতিতে ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার শপথই নেয়া হলো। তাই এ নিয়মেই জান ও মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে।

২. ইসলামী সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে যে কোন নির্দেশ বা দায়িত্ব দেয়া হবে, তা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী না হলে বিনা দ্বিধায় পালন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে দুনিয়ার কোন রকম ক্ষয়-ক্ষতির পরওয়া করা চলবে না।

৩. যদি সংগঠনের কোন দায়িত্বশীলের নির্দেশ সঠিক নয় বলে কারো মনে হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা করে মিমাংসায় পৌঁছতে হবে। আলোচনা ছাড়াই নির্দেশ পালনে অবহেলা করা হলে বাইয়াতের খেলাফ হবে বলে এ বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

৪. কোন বিশেষ অসুবিধা বা ওযরের কারণে যদি কোন নির্দেশ পালন করা অসম্ভব মনে হয়, তাহলে দায়িত্বশীলের নিকট ঐ ওযর পেশ করতে হবে। সংগঠন যে সিদ্ধান্ত দেয় তাই চূড়ান্ত বিবেচনা করতে হবে। সংগঠনের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া নিজেই কোন ওযরের অজুহাতে নির্দেশ পালন না করলে বাইয়াতের খেলাফ কাজ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

সব আন্দোলনেই শপথের রীতি আছে

বাইয়াতের মর্মকথা হলো আনুগত্যের শপথ। যারা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্যে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে আন্দোলন করে, তারা স্বাভাবিক কারণেই

সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষ ধরনের শপথের মাধ্যমে তাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের ব্যবস্থা করে। ইসলামী আন্দোলন ছাড়াও সব রকম আন্দোলনেই এ জাতীয় শপথের রীতি আছে। লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জনের যে শপথ নেয়া হয় তা অগ্নি-শপথ বা রক্ত-শপথ বা দৃপ্ত-শপথ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমনকি নিজ দেহের রক্ত দিয়ে শপথ নামায় দরখাস্ত করার রীতিও চালু রয়েছে। কিন্তু ইসলামে একমাত্র আল্লাহর নাম নিয়েই শপথ নেয়া হয়।

রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে একথা প্রমাণিত যে, ইকামাতে দীনের কাজ সব ফরযের বড় ফরয। এ কাজের জন্যই আল্লাহ পাক রাসূল পাঠিয়েছেন বলে কয়েকটি সূরায় ঘোষণা করেছেন।

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-

'তিনিই সে সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও আনুগত্যের একমাত্র সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, যেন রাসূল (সা.) তাকে (বিধানকে) আর সব রকমের আনুগত্যের বিধানের উপর জয়ী করেন।' (সূরা তাওবা ৩৩, সূরা ফাত্হ ২৮ ও সূরা সফ ৯ আয়াত)

এ বিরাট কাজটি এমন যে নবীর পক্ষেও এ কাজ একা করা সম্ভব নয়। তাই এ কাজের জন্য একদল যোগ্য লোক তৈরি করার প্রচেষ্টা সকল নবীই করেছেন। যে নবী প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক পাননি তাঁর হাতে ইসলাম বিজয়ী হয়নি বা দীন কায়েম হতে পারেনি।

এ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইকামাতে দীনের জন্য মুসলিমদের জামায়াত বা সংগঠন অপরিহার্য। অর্থাৎ ইকামাতে দীনের এ বড় ফরয কাজটির জন্য জামায়াতবদ্ধ হওয়াও ফরয। এভাবেই জামায়াতবদ্ধ হওয়া দ্বিতীয় বড় ফরয। বাইয়াতই হলো জামায়াতী বন্ধনের সূত্র। তাই ইকামাতে দীনের জন্য বাইয়াত ছাড়া উপায় নেই। প্রকৃত কথা এই যে, ঐ বাইয়াতই আসল ইসলামী বাইয়াত যা ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে ইসলামী সংগঠনের মধ্যে চালু হয়।

মুসলমানদের যেসব সংগঠনে বাইয়াত পরিভাষাটি ব্যবহার করা সত্ত্বেও

ইকামাতে দীনের কোন কর্মসূচি ও কর্ম তৎপরতা নেই, সেখানে বাইয়াতের আসল হাকিকাত নেই। নামায, রোযা ও যিকরের মতো ইসলামে বহু পরিভাষা যেমন মুসলিমদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও এ সবের হাকিকাত চর্চা খুব কমই রয়েছে, তেমনি বাইয়াত পরিভাষাটির অবস্থাও তাই হয়ে আছে।

প্রকৃত পক্ষে বাইয়াত পরিভাষাটির দ্বারা এমন ইসলামী সংগঠনই বুঝায় যা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ এর উদ্দেশ্যেই গঠিত। রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতই এর আদর্শ নমুনা। বাইয়াতই ঐ জামায়াতের প্রাণ শক্তি।

সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা একথাই বলেছেন যে, তিনি ঐ সব মু'মিনের জান ও মালই খরিদ করেছেন 'যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, দুশমনকে মারে এবং নিজেরাও নিহত হয়।' দীনে হককে কায়েমের আন্দোলন ছাড়া বাতিলের সাথে এ লড়াই হবার কোন কারণই নেই। সুতরাং কুরআন পাকে যে বাইয়াতের কথা বলা হয়েছে তা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্যেই (ইকামাতে দীনের আন্দোলনের জন্যই বাইয়াত দরকার। আর বাইয়াতের মাধ্যমেই জামায়াতবদ্ধ হতে হয়। জামায়াতবদ্ধ না হয়ে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

ইকামাতে দীন এর সাথে জামায়াত ও বাইয়াতের সম্পর্ককে নামায ও ওযুর সম্পর্কের সাথে তুলনা করা যায়। আল্লাহ্ পাক নামাযের জন্যই ওযুকে ফরয করেছেন। নামাযই হলো আসল ফরয। ঐ ফরযটি ওযু ছাড়া হয়না বলেই ওযু ফরয। তেমনিভাবে জামায়াত ও বাইয়াত ছাড়া ইকামতে দীনের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। ইকামাতে দীনই আসল ফরয। ঐ ফরযের প্রয়োজনেই জামায়াত ফরয আর বাইয়াতের বন্ধন ছাড়া জামায়াত মজবুত হতে পারে না এবং জামায়াতের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হতে পারে না। অর্থাৎ জামায়াতবদ্ধ হবার ফরযটি বাইয়াতের মাধ্যমেই আদায় হয়।

কেউ যদি ওযু করে কিন্তু নামায আদায় করার প্রয়োজন মনে না করে তাহলে সে ওযুর কোন সওয়াব পাবে না। সে ওযু করেছে না বলে হাত মুখ

ধুয়েছে বলাই উচিত হবে। যে নামাযের ধার ধারে না সে ওযুর অঙ্গগুলো ওযুর মতো ধুয়ে নিয়েছে বলেই সে অযু করেছে বলা ঠিক হবে না। কারণ নামাযী লোকই ওযু করে থাকে এবং সে নামাযী নয় বলে ওযু করেনি মনে করতে হবে।

তেমনিভাবে ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্য ছাড়া যে বাইয়াত তা আসল বাইয়াত নয়। ইসলামে বাইয়াতের যে হাকিকাত তা এ বাইয়াতে পাওয়া যায় না। তবুও বাইয়াতের পরিভাষাটি যেভাবেই চালু থাকুক তা সমাজে বেঁচে আছে বলেই এর আসল হাকিকাত চর্চা কাজে লাগতে পারে। যদি বাইয়াত কথাটি লোকের নিকট পরিচিতই না থাকতো তাহলে এর মর্ম বুঝানো আরও কঠিন হতো। যেমন সমাজে যদি নামাযের প্রচলন না থাকতো তাহলে নামাযের হাকিকাত চর্চা করা আরও মুশকিল হতো।

আসল বাইয়াত আল্লাহর নিকট

হুদায়বিয়াতে সাহাবায়ে কেরামের নিরস্ত্র অবস্থা ও কুরাইশদের সাথে লড়াই-এর শপথ করার ঘটনাকে সূরা আল ফাত্হে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ-

'হে রাসূল যারা আপনার নিকট বাইয়াত হয়েছে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট বাইয়াত হয়েছে। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে।' (সূরা আল ফাত্হ : ১০ আয়াত)

মুমিনের জান ও মাল আল্লাহর নিকট বিক্রয় করার পর তা মু'মিনের হাতেই আমানত রাখা হয়। তাই মু'মিন সে আমানত ইসলামী সংগঠনের মাধ্যমে দীনের পথে কাজে লাগায়। এভাবে কাজে লাগানোকে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে গ্রহণ করেন তা এ আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যখন মু'মিন তার জীবন উৎসর্গ করার কথা

সংগঠনের নেতার নিকট ঘোষণা করে তখন সে ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই নিকট করা হয়। হুদায়বিয়ার ঐ শপথ রাসূল (সা.)-এর নিকট যেভাবে করা হয়েছে তা যেন আল্লাহরই নিকট করা হলো। তাই তাঁরা যখন রাসূল (সা.)-এর হাতে হাত দিয়ে শপথ করছিলেন তখন আল্লাহর হাতেই যেন হাত দিয়ে শপথ করেছিলেন। তখন আল্লাহর হাতেই যেন হাত দিয়েছিলেন। জিহাদ ও ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে বাইয়াত হলে তা আসলে আল্লাহরই নিকট হয়ে থাকে।

জামায়াতে ইসলামীর রুকনগণ শপথ গ্রহণের সময় যেসব কথা উচ্চারণ করেন তাতে নিম্নলিখিত আয়াতটিও রয়েছে :

إِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ. وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

‘আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।’ (সূরা আল আনআম ১৬২)

এ আয়াতের মাধ্যমে যে বাইয়াত নেয়া হয় তা আসলে আল্লাহ পাকের নিকটই বাইয়াত করা হয়।

জামায়াতী জিন্দেগীর গুরুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। ইসলাম মানুষেরই জন্য। তাই ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই এমন বিধান দিয়েছে যা মানব সমাজের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ। তাই ব্যক্তিকে সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইসলাম এতো বিস্তারিত বিধি-বিধান দিয়েছে।

ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত একটি ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ বিধানই মানব জাতির কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। এ জাতীয় বিধান একমাত্র আল্লাহই দিতে সক্ষম। তাই ইসলামই একমাত্র বিশ্বজনীন বিধান।

ঐ পূর্ণাঙ্গ বিধানকে মানব সমাজে চালু করার দায়িত্ব দিয়েই রাসূল (সা.)-কে পাঠানো হয়েছে। সমাজ গঠনের কাজ সামাজিক প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য রাসূলের চেয়ে বেশী যোগ্য কেউ হতে পারে না। কিন্তু সব রাসূলের জীবনে ইসলাম বিজয়ী হয়নি। কারণ ইসলামকে বিজয়ী করার যোগ্য একদল (জামায়াত) লোক যোগাড় না হলে যোগ্যতম রাসূলের পক্ষেও এ কাজ সমাধা করা সম্ভব নয়।

এ কারণেই প্রত্যেক রাসূল সকল মানুষকে দীনের দাওয়াত দেয়ার পর যারা সাড়া দিয়েছেন তাদেরকে فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর) বলে সাংগঠনিক দাওয়াতও দিয়েছেন। এ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের প্রতি ঈমান আনা যেমন ফরয ঈমানদারদের জামায়াতবদ্ধ হওয়াও তেমনি ফরয।

রাসূল (সা.) জামায়াতী জিন্দেগীর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলেছেন :

أَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ الْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

১. 'আমি তোমাদেরকে এমন পাঁচটি কথার হুকুম দিচ্ছি যা আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন - সংগঠনবদ্ধ হওয়া, নেতার কথা শুনা, আনুগত্য করা, হিজরত করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযি)

اِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدُكُمْ-

২. 'যখন তিন জন লোক সফরে যাও তখন তোমাদের একজনকে আমীর বানাও।' (আবু দাউদ)

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ-

৩. 'যে ব্যক্তি জামায়াত পরিত্যাগ করল সে ইসলামের শিকল তার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলল।' (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযি)

মুসলিম জীবনে জামায়াতের এ বিরাট গুরুত্বের দরুনই ফরয নামায জামায়াতে আদায় করার জন্য এতো তাকীদ হাদীসে রয়েছে। যারা নামাযের জামায়াতে আসেনা রাসূল (সা.) তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন।

কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন একথাই প্রমাণ করে যে, জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরয।

ইকামাতে দীন ও জামায়াতী জিন্দেগী

ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে জামায়াতবদ্ধ করেছেন। দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব যদি ফরয

হয়ে থাকে তাহলে জামায়াতবদ্ধ হওয়াও ফরয হওয়া স্বাভাবিক। আর জামায়াতবদ্ধ হবার বন্ধনসূত্রই হলো বাইয়াত। বাইয়াতের মাধ্যমেই জামায়াতের বন্ধন মজবুত হয়।

জামায়াতে ইসলামীর রুকন হিসেবে যে শপথ গ্রহণ করতে হয় তা প্রকৃতপক্ষে ঐ বাইয়াতেরই বাস্তব রূপ। শুধু শপথ বা হলফ শব্দ দ্বারা ঐ দীনী গুরুত্ব বুঝায় না যা বাইয়াত শব্দ দ্বারা বুঝায়। তাই রুকনিয়াতের শপথকে বাইয়াতের মর্যাদা সম্পন্ন মনে করা উচিত। এ ছাড়া জামায়াতের আনুগত্যের সঠিক শরয়ী চেতনা জাগ্রত হতে পারে না।

প্রত্যেক সংগঠনেই শপথের রীতি চালু রয়েছে। জামায়াতের রুকনদের শপথ গতানুগতিক ধরনের নয়। এ শপথের ভাষা থেকে বুঝা যে, বাইয়াতের শরয়ী প্রয়োজন এতে সঠিকভাবেই পূরণ হয়।

বাইয়াত ও ইসলামী রাষ্ট্র

কেউ কেউ মনে করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথেই বাইয়াতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তাদের মতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকলে বাইয়াতেরও প্রয়োজন নেই। একথার যুক্তি বোধগম্য নয়। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা আপনিতেই চালু হয় না। জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম। আর জামায়াতী জিন্দেগীর সাথেই বাইয়াতের সম্পর্ক। বাইয়াতের মজবুত সূত্রে আবদ্ধ জামায়াতের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হওয়া সম্ভব। সূতরাং বাইয়াতের ফসলই ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্র বাইয়াত ব্যবস্থা ছাড়া কায়েমই হতে পারে না।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হবার পূর্বে রাসূল (সা.) এর মাক্কী জীবনে কি সাহাবায়ে কেরাম বাইয়াত হননি? রাসূল (সা.)-এর নিকট বাইয়াত হওয়ার জন্য কি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়েছিল?

যুক্তির বিচারেও একথা না মেনে উপায় নেই যে, জামায়াত ও বাইয়াতই আগে এবং ইসলামী রাষ্ট্র পরে।

কে কোন জামায়াতে বাইয়াত হবেন?

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কথাটির অস্তিত্ব থাকলেও এর সাংগঠনিক কোন রূপ নেই। চার মাযহাবের অনুসারী ও আহলে হাদীস হিসেবে পরিচিত সকল মুসলিমই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে সংক্ষেপে সুন্নী বলা হয়। আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত কোন মাযহাবই শিয়া মতাবলম্বীগণকে তাদের মধ্যে গণ্য করেন না। অর্থাৎ শিয়াগণ সুন্নী হিসেবে গণ্য নন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা রাসূলুল্লাহ

(সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতের অনুসারী। আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে একমাত্র উৎকৃষ্ট আদর্শ (উসওয়াতুন হাসানা) ঘোষণা করেছেন এবং রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবাগণকে তাঁর আদর্শের সত্যিকার অনুসারী বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলই একমাত্র উসওয়াতুন হাসানা বটে, কিন্তু ইত্তেবায়ে রাসূলের (রাসূলের আনুগত্য) ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামই উসওয়ায়ে হাসানা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত দুনিয়ার সকল মুসলমান সাংগঠনিক আকারে কোন জামায়াত নয়। জামায়াতের আসল পরিচয়ই হলো ইমারত। আমীর ছাড়া কোন জামায়াত হতে পারে না। দুনিয়ার সকল সুন্নী কোন এক ইমারতের অধীন নয়। এমনকি একই দেশের সকল সুন্নীগণও এক আমীরের নিকট বাইয়াত হন না।

সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে সুন্নীদের মধ্যে যারা ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে কোন সংগঠন (জামায়াত) কায়েম করেন তাদের মধ্য থেকে ঐ জামায়াতের একজন আমীর নির্বাচিত হবেন। ঐ জামায়াতের আর সব সদস্য ঐ নির্বাচিত আমীরের মাধ্যমেই বাইয়াত হবেন। এ আমীর শুধু এ জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত লোকদেরই আমীর। যারা এ জামায়াতে যোগদান করবে না তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হলেও এ জামায়াতের আমীরের নিকট তাদের বাইয়াত হওয়া জরুরী নয়।

এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীর আমীর দেশের সকল সুন্নী মুসলমানের আমীর নন। যারা জামায়াতে ইসলামীর সদস্য (রুকন) হন শুধু তারাই এই আমীরের মাধ্যমে জামায়াতের নিকট বাইয়াত হন। এমন কি জামায়াতে ইসলামীর নিষ্ঠাবান কর্মী হলেও সদস্য বা রুকন না হওয়া পর্যন্ত কেউ বাইয়াতের মধ্যে শামিল বলে গণ্য হয় না। এমন অনেক যোগ্য কর্মী আছেন রুকনদের চেয়েও বেশী কাজ করেন। কিন্তু তারা নিজের জান ও মাল ইকামাতে দীনের জন্য উৎসর্গ করার শপথ নিতে রাযী না হলে তাদেরকে রুকন হিসেবে গণ্য করা হয় না। এ শপথকেই ইসলামী পরিভাষায় বাইয়াত বলা হয়।

বাইয়াত কি প্রত্যাহার করা যায়?

আসল বাইয়াত তো আল্লাহ তায়ালার নিকটই করা হয়। এ বাইয়াত ঈমানেরই দাবী। এ বাইয়াত প্রত্যাহার করা মানে ঈমান ত্যাগ করা। বেহেশতে যাবার নিয়ত থাকলে এ বাইয়াত প্রত্যাহার করার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব।

কিন্তু ঐ বাইয়াতের দাবী পূরণের জন্য ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে গঠিত কোন জামায়াতের নিকট যে বাইয়াত হতে হয় তা দীনের স্বার্থে অবশ্যই প্রত্যাহার করা যেতে পারে। কোন জামায়াতের নিকট বাইয়াত হবার পর যদি এর চাইতেও উন্নতমানের দীনী জামায়াতের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে নিম্নমানের জামায়াতের নিকট থেকে বাইয়াত প্রত্যাহার করে ঐ উন্নতমানের জামায়াতের নিকট বাইয়াত হওয়াই উচিত। এ অবস্থায় বাইয়াত প্রত্যাহার করা মোটেই দোষণীয় নয়। কারণ উৎকৃষ্টতর জামায়াতের নিকট বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যাহার করা আসলে প্রত্যাহার নয়, বাইয়াতের স্থান বদল মাত্র।

কিন্তু নিজের কোন দুর্বলতার দরুণ বা ইসলামী আন্দোলনের পথে চলা কঠিন মনে করে যদি কেউ বাইয়াত প্রত্যাহার করে বা জামায়াত পরিত্যাগ করে তাহলে সে ঈমানের চরম দুর্বলতার পরিচয়ই দেয়। এ বিষয়ে হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে –

يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شُذَّشُذَّ فِى النَّارِ-

'জামায়াতের সাথে আল্লাহর রহমত থাকে। যে বিচ্ছিন্ন হয় সে দোযখেই নিক্ষিপ্ত হয়।' (তিরমিযি)

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

'যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেলো সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম)

مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

'যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যাগ করল এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম)

জামায়াতে ইসলামী ও বাইয়াত

জামায়াতে ইসলামী আমীর ও রুকনদের মধ্যে বাইয়াতের এ সম্পর্কের ব্যাপারে যাতে আনুগত্যের সীমা সামান্যও লঙ্ঘন না হয় সে উদ্দেশ্যে একটি গঠনতন্ত্র দ্বারা গোটা সংগঠন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আমীর রুকনদের ভোটে নির্বাচিত মজলিসে শূরার নিকট জওয়াবদিহী করতে হয়। কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে আমীরের কোন ভুল হলে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেবার জন্য গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এমনকি আমীরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করার জন্যও গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে।

পীর-মুরীদীর মধ্যে বাইয়াত-এর পরিভাষাটি সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হয়। জামায়াতের মধ্যে রুকনিয়াতের শপথের ক্ষেত্রে তা অনেক ব্যাপক অর্থে প্রচলিত। জামায়াতের রুকন হওয়ার মানে আল্লাহর দীনের জন্য জান ও মাল আল্লাহর নামে ও তাঁরই সন্তুষ্টির আশায় সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার শপথ নেয়া। বাইয়াতের যে অর্থ সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল জামায়াতের রুকনিয়াত দ্বারা সে অর্থই বুঝায়। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে বাইয়াত পরিভাষাটি ব্যবহার করা না হলেও এর চেতনা ও তাৎপর্য অবশ্যই রুকনিয়াতের শপথের মধ্যে রয়েছে।

আল্লাহর দীন কায়েমের মহান সংকল্প নিয়ে নিজের জান ও মাল, সময় ও শ্রম এবং দৈহিক ও মানসিক যাবতীয় যোগ্যতা কুরবানী দেবার যে শপথ নিয়ে জামায়াতের রুকনিয়াত কবুল করতে হয় তা যে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় বাইয়াতেরই অনুরূপ সে উপলব্ধি ও চেতনা সৃষ্টিই এ পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ পাক বাইয়াতেরই এ চেতনা দ্বারা সকল রুকনকে উদ্বুদ্ধকরণ ও কর্মতৎপর রাখুন - আমীন।

১৯৪১ সালে মাওলানা মওদূদী (র.)-এর উদ্যোগে লাহোরে সর্ব প্রথম যখন জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয় তখন জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন তার বিবরণ নিম্নরূপ :

"সর্ব সম্মতভাবে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবকে আমীর নির্বাচিত করা হয়। বাইয়াতের প্রচলিত রীতি অবলম্বন করা হয়নি। বরং গোটা জামায়াত একসাথে এ শপথ নিয়েছে যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী সবাই আমীরের আনুগত্য করবেন এবং তাঁর হুকুম মেনে চলবেন। এই বাইয়াতে আ'ম (সামষ্টিক বাইয়াত) আদায়ের পর আবার ঐ (কান্নাকাটির) অবস্থায়ই সৃষ্টি হলো যা পূর্বে ঈমান তাজা করার সময় হয়েছিল।

জামায়াতের কার্য-বিবরণী প্রথম খণ্ডের এ বিবরণ থেকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে যে, জামায়াতের সূচনা থেকেই বাইয়াতের চেতনা সবার মধ্যে জাগরূক ছিল। আমীরে জামায়াতের আনুগত্যের যে শপথ তারা নিলেন তা যে ইসলামী পরিভাষায় বাইয়াতেই ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং জামায়াতের রুকনগণ যে শপথ নেন তা অবশ্যই বাইয়াত হিসেবে গণ্য।

জামায়াতের কর্মী ও সহযোগী সদস্যদের বাইয়াত

যারা জামায়াতে রুকনিয়াতের শপথ নেননি, কিন্তু কর্মী ও সহযোগী সদস্য হিসেবে ইসলামী আন্দোলনে শরীক আছেন তারা রুকনদের মতো পূর্ণাঙ্গ বাইয়াত না করলেও ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে আংশিক বাইয়াত করেন। যারা সহযোগী সদস্য হন তারা জামায়াতের সাথে সহযোগিতার শপথ গ্রহণ করেন এবং যারা কর্মী তারা রুকন হওয়ার পথে এগিয়ে যাবার শপথই করেন। রুকনদের বাইয়াত হলো عَزِيْمَتْ এর (দৃঢ় সংকল্পের) বাইয়াত। যারা কর্মী তারা এর প্রস্তুতি গ্রহণেরই বাইয়াত নেন। আর যারা সহযোগী তারা সহায়তা করার জন্য বাইয়াত হন।

কিন্তু ঈমানের দাবী হলো পূর্ণাঙ্গ বাইয়াত। ঈমানের এ দাবী পূরণের জন্য প্রত্যেক ঈমানদারেরই আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও সংকল্প থাকা উচিত। কারণ ঈমানের আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কামিয়াবী। এ মহান উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে পূর্ণাঙ্গ বাইয়াতের পথেই এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আখিরাতের সাফল্য লাভ করার লক্ষ্যে পরিপূর্ণভাবে বাইয়াত হয়ে শরয়ী দাবী পূরণ করার তাওফীক দান করুন - আমীন।

জামায়াতে ইসলামীকে জানার জন্য পড়ুন

জামায়াতে ইসলামীর পরিচয়

১. পরিচিতি– জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
২. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
৩. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
৪. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
৫. জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন

৬. গঠনতন্ত্র– জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৭. মেনিফেস্টো– জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৮. সংগঠন পদ্ধতি– জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৯. ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই (কর্মী ও রুকন)
১০. অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
১১. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন

১২. সত্যের সাক্ষ্য
১৩. ইকামাতে দ্বীন
১৪. ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি
১৫. হেদায়াত
১৬. ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী
১৭. খাঁটি মুমিনের সহীহ্ জযবা
১৮. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
১৯. ইসলামী বিপ্লবের পথ
২০. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী
২১. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী
২২. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

২৩. কার্যবিবরণী– জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (১ম ও ২য় খন্ড)
২৪. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২৫. জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় ইতিহাস
২৬. মাওলানা মওদূদী (র.) একটি জীবন একটি ইতিহাস

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯